

শিক্ষাসংহারের সরকারি নকশা

১০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ’২৬’ পাশ হয়েছে। পূর্বতন তৃণমূল সরকার ২০১৭ সালে যে শিক্ষা আইন প্রণয়ন করেছিল, তা ছিল সর্বস্বাধীনভাবে জনস্বার্থবিরোধী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বদলি বিল

খর্ব করার একটি নীলনকশা। বিজেপি সরকার সে আইন বাতিল তো করেইনি, বরং তৃণমূলের দেখানো পথেই সেই আইন প্রয়োগ করেছে। এবার শিক্ষকদের উপর আরও সরকারি নিয়ন্ত্রণ কায়েমের জন্য সেই আইনেরই সংশোধনী এসেছে। বিলটি কার্যকর হলে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি করার ক্ষমতা সরকার পাবে। সরকারের যুক্তি, এর মাধ্যমে নাকি অভিজ্ঞ শিক্ষক ও কর্মীদের অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে শিক্ষার মান উন্নত করা যাবে।

রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি পৃথক স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেকের নিজস্ব আইন, নিয়োগব্যবস্থা, অনুমোদিত পদ এবং পরিচালনা-কর্তৃপক্ষ রয়েছে। একজন শিক্ষক যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁর নিয়োগকর্তা। তাঁরা সরকারি দপ্তরের কর্মচারী নন, যাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে বদলি করা যায়। এই বদলি শুধু কর্মস্থল পরিবর্তনের বিষয় নয়। এর সঙ্গে একজন শিক্ষক বা কর্মীর চাকরির শর্ত, পদ,

বেতন, সিনিয়রিটি, পদোন্নতি, অবসরকালীন সুবিধা এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রশ্ন জড়িত। যে শর্তে একজন শিক্ষক চাকরিতে যোগ দিয়েছেন, পরে সেই চাকরির মৌলিক কাঠামো বদলে দিয়ে তাঁকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো কতটা ন্যায়সঙ্গত, সেই প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবেই উঠছে।

শিক্ষার উন্নতির আসল সমস্যাগুলি কি এই বদলি-আইন দিয়ে সমাধান করা যাবে? সরকার শিক্ষার উন্নয়ন চাইলে শিক্ষা খাতে ব্যয়বৃদ্ধি বৃদ্ধিকরত, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, ক্লাসরুম সহ ভেঙে পড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে ব্যবস্থা নিত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ে থাকা শত শত শূন্যপদে নিয়োগের ব্যবস্থা করত এবং ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অনুযায়ী নিয়মিত নতুন শিক্ষক পদ তৈরি করত। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অশিক্ষক কর্মচারীও নিয়োগ করত। উচ্চশিক্ষায় প্রান্তিক অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশের সুযোগও সুনিশ্চিত করত। লাগামছাড়া ফি বৃদ্ধি, সেলফ-ফিন্যান্সিং কোর্স, চার বছরের স্নাতক কোর্স সহ একের পর এক শিক্ষাসংকোচনকারী পদক্ষেপ নিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) চালু করতে অতিসক্রিয় হত না। কর্পোরেট স্বার্থে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে গুটিয়ে ফেলার তোড়জোড় করত না। শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষের জন্য অপরিহার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতাকেও খর্ব করত না।

অন্য দিকে, এই বদলি-ব্যবস্থা চালু হলে

ছয়ের পাতায় দেখুন

আলিপুরদুয়ারে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এসইউসিআই(সি)-র আলিপুরদুয়ার লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর এক বিক্ষোভ মিছিল জেলা শহর পরিভ্রমণ করে এবং প্রশাসনিক ভবনের সামনে সভা হয়। বক্তব্য রাখেন

দলের জেলা কমিটির সদস্য পীযুষ কান্তি শর্মা, আলিপুরদুয়ার লোকাল কমিটির সদস্য সমরেশ ভূঁইয়ালী, প্রদীপ রায়, লোকাল



কমিটির সম্পাদক লক্ষ্মণ মণ্ডল প্রমুখ।

মোদি-শাসনের পঁচিশ বর্ষপূর্তি উদযাপন ধসে পড়া ভাবমূর্তি উদ্ধারের বৃথা চেষ্টা

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১১ সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতিতে বলেন,

প্রধানমন্ত্রী মোদির শাসনক্ষমতার পঁচিশ বর্ষপূর্তি উদযাপনের জন্য শাসক বিজেপি সরকার দেশ জুড়ে ‘সেবা সঙ্কল্প অভিযান’ নাম দিয়ে একমাসব্যাপী জনসংযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এই কর্মসূচিতে ভারতের ভঙ্গুর অর্থনীতিকে দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে নিয়ে যাওয়া, বিশ্বমঞ্চে ভারতের সম্মান

ও ভাবমূর্তি তুলে ধরার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদির ভূমিকা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার কথা বলা হচ্ছে। বিজেপির এই প্রচারাভিযান, জনমানসে প্রধানমন্ত্রীর ক্রমাগত ধসে পড়া ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের বৃথা চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাস্তবে, প্রধানমন্ত্রী মুষ্টিমেয় কয়েকজন একচেটিয়া পুঁজিপতিকে বিশ্বস্তভাবে সেবা করেছেন, যার পরিণামে সারা দেশ ভয়াবহ সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে। দেশের

দুয়ের পাতায় দেখুন

বঞ্চনার শেষ কবে, প্রশ্ন মিড ডে মিল কর্মীদের



সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি সহ নানা দাবিতে মিড ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ কলকাতায়। ৭ সেপ্টেম্বর (বিস্তারিত ২ পাতায়)

জিডিপি-র বৃদ্ধি নাকি বিপুল মানুষের দুর্দশা তবে বাড়ছে কেন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হইচই ফেলে দিয়েছেন, কারণ নাকি ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল থেকে জুন-২০২৬) বেড়েছে ৭.৮ শতাংশ। একেবারে রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি! এই অনুসারে ভারতের অর্থনীতির বহর দাঁড়িয়েছে ৮৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৭১ কোটি টাকা। খবরটা এতটাই ভাল যে, অর্থমন্ত্রক বা পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের বদলে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নিজে এ কথা ঘোষণা করেছেন। ঘোষণা, তা নিয়ে উৎসব, এ সবার মধ্যেও যে কথাটা না বললে নয়— জিডিপি এত বিপুল হারে বাড়ার মানে দাঁড়ায় দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাজকর্ম তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে। তাতে বাড়ার কথা বিনিয়োগ, বাড়ার কথা শিল্প উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মানুষের রোজগার। এর কোনটা বেড়েছে?

বাস্তব সরকারি পরিসংখ্যানে জুলজুল করছে যে তথ্য, তা দেখাচ্ছে এর একটিও বাড়েনি। ফিন্যান্স,

তথ্যপ্রযুক্তি, নির্মাণের মতো কিছু পরিষেবা এবং গাড়ি বিক্রি ও ডিজিটাল লেনদেনের হার কিছুটা বাড়লেও কলকারখানায় উৎপাদনের সূচক নেমেছে ৫২.৮ শতাংশে। বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে যা সবচেয়ে কম (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭.০৯.২০২৬)। সারা ভারতেই যুব সমাজ কাজ এবং উপযুক্ত রোজগারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। কোটি কোটি মানুষকে সেই ফুটপাথেই পড়ে থাকতে হচ্ছে। আজও দেশের ৮০ কোটি মানুষ রেশনে দেওয়া বিনামূল্যের খাদ্য শস্যের ওপর নির্ভরশীল। এই সময়ে পশ্চিম এশিয়ায় সাম্প্রতিক ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারতের অর্থনীতি ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জ্বালানি তেল, গ্যাসের জোগানে ঘটতি সহ আমেরিকার চড়া শুল্ক এবং আমেরিকা-ইউরোপের চাপানো নানা বিধিনিষেধের ধাক্কা সামলাতে হয়েছে ভারতের অর্থনীতিকে। দেশে নতুন বিদেশি পুঁজি আসার

দুয়ের পাতায় দেখুন

ইউজিসি চেয়ারপার্সন পদে আইএএস প্রতিবাদ সেভ এডুকেশন কমিটির

কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চশিক্ষা সচিব হিসাবে কর্মরত এক আইএসএস অফিসারকে ইউজিসি-র চেয়ারপার্সন হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর প্রতিবাদ করে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক তরুণকান্তি নস্কর ৩ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, ইউজিসি আইনে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, চেয়ারম্যান এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে

নির্বাচিত হবেন, যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনও রাজ্য সরকারের আধিকারিক নন। এই সিদ্ধান্ত ওই আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

তিনি বলেন, বর্তমান শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে, এই সিদ্ধান্ত তারই একটি। আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছি এবং প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

শিক্ষক দিবসে সরকারি অনুষ্ঠান বয়কট বিপিটিএর

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা, শিক্ষকদের মতামত ছাড়াই শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার প্রতিবাদে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ৫

আরও বহু স্কুল অচিরেই বন্ধ হবে। শিক্ষকরা হবেন উদ্ধৃত। দীর্ঘ কয়েক দশক পাশ্চাত্য নেই, পরিকাঠামো সেই মাত্রা আামলের, নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগ হয়নি, শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক নেই।



সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের সরকারি অনুষ্ঠান বয়কট করে। কলকাতায় কলেজে স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে (ছবি) এবং রায়গঞ্জ ও কোচবিহার শহরে অবস্থান বিক্ষোভ করে। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। কলেজ স্কোয়ারে সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা সহ বিভিন্ন জেলা নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি দিলীপ মাইতি।

আনন্দ হাণ্ডা বলেন, দেশে প্রতিদিন ১৩টি স্কুল বন্ধ হচ্ছে। রাজ্যসভায় পেশ হওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী গত বছর দেশে ৪,৭৯১টি স্কুল বন্ধ হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৫৬৮টি। স্কুল বন্ধের কারণ অনুসন্ধান না করে কম ছাত্র যুক্ত স্কুল মার্জ করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। ফলে

দেশে ১,০০৮,৪৩টি স্কুল এক শিক্ষক বিশিষ্ট, রাজ্যে প্রাথমিকে ৬,৭৬৯টি। বেশিরভাগ স্কুল চলছে ১-২ জন শিক্ষক দিয়ে। স্বাধীনতার ৮০ বছরেও প্রাথমিকে কোনও শিক্ষাকর্মী নেই। শিক্ষকদের দিয়ে সারা বছর ধরে শিক্ষাদান বহির্ভূত কাজ এমনকি ভোটের কাজ, জনগণনা করানো হচ্ছে। কার্যত শিক্ষকদের শিক্ষাদানের কাজটাই গৌণ হয়ে পড়েছে।

রাজ্যে বিজেপির সরকার ক্ষমতায় আসার ৪৫ দিনের মধ্যেই কর্মচারীদের সমস্ত বকেয়া ডিএ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও কেন্দ্রীয় হারে ডিএ কবে পাওয়া যাবে, এখনও তার কোনও কিনারা হয়নি। অন্য দিকে সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে ২০০৯-এর রোপার বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ সরকারি কর্মচারীদের দেওয়া হলেও শিক্ষক তথা গ্রান্ট-ইন-এইড কর্মচারীদের দেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের সহযোগিতায় রাজ্যে ১০০০ বিদ্যাবারতী বিদ্যালয় স্থাপনের নামে আরএসএস পরিচালিত শিক্ষালয় করার ঘোষণা করেছেন। চালু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে আর এস এস-এর ভাবাদর্শে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কী উদ্দেশ্যে, প্রশ্ন তোলেন তিনি।

সরকারি কর্মীর স্বীকৃতির দাবিতে

মিড-ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ কলকাতায়

সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৭ সেপ্টেম্বর প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে কর্মীদের বারো মাসের মজুরি, উৎসব ভাতা, ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা বেতন ও সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা ভাতা, পেনশন-পিএফ-বোনাস সহ বিভিন্ন দাবিতে প্রায় ৫ হাজার মিড-ডে মিল কর্মীর সূক্ষ্মাল বালিষ্ঠ দৃপ্ত মিছিল শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ধর্মতলায় পৌছয়। ওখান থেকে চারজনকে একটি প্রতিনিধিদল সংগঠনের সভানেত্রী সুনন্দা পাণ্ডার নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে

যায়। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা পিছিয়ে পড়া, গরিব, বঞ্চিত অংশের মানুষ এই মিড-ডে মিল কর্মীরা অত্যন্ত যন্ত্রণার সঙ্গে নিজেদের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম রাজ্য সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা কর ও মনোরমা হালদার। এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ও সহ সভাপতি নন্দ পাণ্ডা দাবি না মানা হলে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। *ছবি : প্রথম পাতায়*

মানুষের দুর্দশা তবে বাড়ছে কেন

একের পাতার পর

বদলে ভারত থেকে পুঁজি বাইরে পাড়ি দিয়েছে। টাকার মূল্যও ক্রমাগত কমে চলেছে। অথচ কেমন করে বেড়ে গেল আর্থিক বৃদ্ধির হার?

বিজেপি সরকারের প্রাক্তন অর্থসচিব সুভাষচন্দ্র গগ্গ অভিযোগ তুলেছেন যে, মোদি সরকার এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে হঠাৎ ভিত্তিবর্ষ পাল্টে দিয়ে এবং ২০২৫-২৬-এর এপ্রিল ত্রৈমাসিকের জিডিপি পরিমাণ ৮৬ লক্ষ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৮০ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি দেখিয়ে এই বছরে জিডিপি বিপুল বৃদ্ধি দেখিয়েছে। দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকস-এর কিছু বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছেন, আর্থিক বৃদ্ধি মাপতে গেলে বহু সূচকের তথ্যকে বিচারে নিতে হয়। পণ্য এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রকৃত হিসাব পেতে গেলে পাইকারি মূল্য সূচকের ভিত্তিতে মূল্যবৃদ্ধিকে বাদ দিলেই শুধু চলে না, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মধ্যবর্তী খরচ বা ইনপুট ও প্রকৃত উৎপাদন বা আউটপুটের মধ্যকার পার্থক্য নির্ধারণে যত্নের সাথে সমস্ত ক্ষেত্রের সূচককে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে মেলাতে হয়। কোন পদ্ধতিতে তা মেলানো হল তা সুস্পষ্টভাবে জানানোটাও আবশ্যিক। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পদ্ধতির কথাই জানায়নি। ফলে, ভিত্তিবর্ষ পরিবর্তনের সরকারি ব্যাখ্যাকে মেনে নিলেও আর্থিক বৃদ্ধির হিসাবে বিজেপি সরকার যে কারচুপি করেছে, তা কোনও মতে অস্বীকার করা যায় না। তাঁরা দেখিয়েছেন, ভারতের ৯০ শতাংশ শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে। ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের অধিকাংশ উৎপাদনই হয় অনথিত্ত্ব ক্ষুদ্র উৎপাদন ইউনিটে, অনেক ক্ষেত্রেই পারিবারিক শ্রমে। জিডিপি পরিমাপ করতে গিয়ে দেশের বিরাট অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের পরিশ্রম সরকার করেনি। জিডিপির প্রথম ত্রৈমাসিকের তথ্য তাই দাঁড়িয়ে আছে সংগঠিত ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত অল্প কিছু নমুনা তথ্যের ওপর। বিপুল সংখ্যার ক্ষুদ্র উৎপাদন ইউনিট এবং অসংগঠিত শ্রমিকদের সংকটকে না দেখে সামান্য কিছু সংগঠিত ও কর্পোরেট শিল্পের তথ্যকেই অসংগঠিত ক্ষেত্রের গড় উৎপাদন বলে দিলে তা উৎপাদন ক্ষেত্রের সঠিক চিত্র হতে পারে না।

এ ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটি-র ফাইলের হিসাব কষে তাকেই উৎপাদনের সূচক হিসাবে দেখিয়েছে, যা কোনওমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর আগেও ম্যানুফ্যাকচারিং অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে সরকার মোট মূল্য উৎপাদনের (গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড) তথ্য প্রকৃত উৎপাদিত মূল্যের তুলনায় ৪০ শতাংশ বাড়তি দেখিয়েছে। অসংগঠিত শিল্প এবং তাতে কাজ করা কোটি কোটি শ্রমিকের প্রকৃত পরিস্থিতি বাদ দিয়ে কর্পোরেট কোম্পানির অফিস

থেকে উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহ করে তা সমস্ত শিল্পের পরিস্থিতি হিসাবে দেখিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। (ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন, চণ্ডীগড়-এর অধ্যাপক যতিন্দর এস বেদি ও ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, মুম্বাই-এর প্রাক্তন অধ্যাপক আর নাগরাজ লিখিত প্রবন্ধ, ৪ সেপ্টেম্বর, দ্য হিন্দু)

বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, ১৪ আগস্ট অর্থমন্ত্রকের প্রেস রিলিজ অনুযায়ী ২০২৫-২৬-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল থেকে জুন) পাইকারি মূল্য সূচক ছিল ১০০.৩ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে এই সূচক ১০৯.৮। তাঁরা দেখিয়েছেন, এই মূল্য সূচকের ভিত্তিতে মূল্যবৃদ্ধিকে বাদ দিলে প্রকৃত আর্থিক বৃদ্ধি দাঁড়ায় মাত্র ০.৮৮ শতাংশ।

অবশ্য সরকার যদি জিডিপি বৃদ্ধির সঠিক তথ্যও দিত, তাতেও কি দেশের খেটে খাওয়া মানুষের কিছু লাভ হত? কখনওই নয়। একটা পুঁজিবাদী দেশে আর্থিক বৃদ্ধি বা জিডিপি বৃদ্ধি কখনও সাধারণ মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি বোঝায় না। আর্থিক সম্পদের বহর বাড়লে লাভ হয় একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের। যত আর্থিক বৃদ্ধি বাড়ে, তত বাড়ে পুঁজিপতিদের সাথে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক বৈষম্য। তাই নরেন্দ্র মোদীরা যখন ভারতকে কখনও বিশ্বের পঞ্চম কখনও তৃতীয় আর্থিক বহরের দেশ বলেন, তা নিয়ে গর্ব করেন, তাতে জনসাধারণের জীবনের কোনও সুবাহা হয় না।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভারতের বিপুল জনসংখ্যা ও অফুরন্ত সম্পদের কারণে এ দেশের আর্থিক বহর এমনিতেই বহু দেশের থেকে বেশি। কিন্তু যে কোটি কোটি মানুষ উৎপাদন করেন, সেই শ্রমিক কৃষকের শ্রমের প্রকৃত মূল্য না দিয়ে তা দেশের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি আত্মসাৎ করে। ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশে ৯৬-৯৭ কোটির মতো কর্মক্ষম মানুষের শ্রমে যে বিপুল উৎপাদন হয় তার জন্য কোনও কৃতিত্বই সরকার কিংবা মালিক পুঁজিপতি শ্রেণি দাবি করতে পারে না। বরং তারা মেহনতি জনগণকে শোষণে নিঃস্ব করে দেয়। মনে রাখা দরকার, ভারতের মাথাপিছু আয় বিশ্বের বহু দেশের তুলনায় অতি নগণ্য। অর্থাৎ আর্থিক বৃদ্ধির বহর যা-ই হোক, তা মানুষের কোনও কাজেই আসে না।

কিন্তু এই বৃদ্ধি নিয়েও যে মিথ্যার কারবার ফেঁদেছে বিজেপি তার তুলনা দুনিয়াতে পাওয়া ভার। এই সরকার বেকারত্বের পরিসংখ্যান থেকে উৎপাদন, কিংবা শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ কোনও বিষয়েই প্রকৃত তথ্য দেয় না। মিথ্যার কারবারই তাদের প্রকৃত পরিচয়। নরেন্দ্র মোদি আবার তা প্রমাণ করলেন।

মোদি-শাসনের পঁচিশ বর্ষপূর্তি উদযাপন

একের পাতার পর

সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র সেই সংকটে বিপন্ন। উগ্র জাতীয়তাবাদের ধূয়ো তুলে এবং চতুর সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্বের গুণগান করে এই কঠিন বাস্তবকে মুছে ফেলা যাবে না।

তিনি বলেন, দেশের জনগণের টাকায় জাঁকজমক করে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর তথাকথিত ‘অবদান’ উদযাপনের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টার আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লিগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে একটি কর্মসূচি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। রচনার দায়িত্ব নেন লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। প্রথম খসড়াটির নাম রাখা হয়েছিল, ‘কনফেশন অফ ফেথ’। এই খসড়াটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রশ্নোত্তরে লেখা বর্তমান রচনাটি দ্বিতীয় খসড়া রূপে এঙ্গেলস তৈরি করেন। কমিউনিজমের আদর্শকে সহজ ভাষায় বোঝাবার জন্য প্রশ্নোত্তর রূপে লিখলেও, এঙ্গেলস এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৮৪৭-এর ২৩ নভেম্বর মাস্ত্রুকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন— প্রশ্নোত্তরে লেখাটির উপর একটু ভাবনা-চিন্তা করো। আমার মনে হয়, এ ভাবে চলবে না। ইতিহাসের ঘটনাবলি কিছু যুক্ত করেই এটা দাঁড় করাতে হবে এবং নামও হওয়া উচিত ‘কমিউনিস্ট ইস্তাহার’। ১৮৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় মাস্ত্রু-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার। সুতরাং বর্তমান প্রশ্নোত্তরের লেখাটিকে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের খসড়া হিসাবেই দেখতে হবে। ৫ আগস্ট এঙ্গেলসের ১৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করছি। এ বার সপ্তম ও শেষ কিস্তি।

প্রশ্ন : কমিউনিস্টদের সঙ্গে সোসালিস্টদের পার্থক্য কী?

উত্তর : তথাকথিত সোসালিস্টদের তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম গোষ্ঠীটি হল সামন্ততান্ত্রিক এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অনুগামীদের নিয়ে— যে দুটি সমাজকে প্রতিদিন ভাঙছে তাদেরই সৃষ্ট বুর্জোয়া সমাজ এবং তার বৃহদায়তন শিল্প ও বিশ্ব বাণিজ্য। সমকালীন সমাজের অনাচার দেখে এই গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত করে, সামন্ততান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যেহেতু এই ধরনের অনাচার ছিল না, তাই সামন্ততন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই সমস্ত অনাচার দূর হতে পারে। তাদের সমস্ত প্রস্তাবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই সূত্রে বাঁধা। সর্বহারা শ্রেণির দুঃখ-দুর্দশায় তাদের সহানুভূতি এবং সমবেদনা প্রকাশ পেলেও, এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রীদের বিরোধিতা করতে হবে কমিউনিস্টদের। কারণ,

- ১) তারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইছে।
- ২) তারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইছে অভিজাতগোষ্ঠী, গিল্ড-মাস্টার ও কারখানা মালিক, স্বৈরাচারী সামন্তপ্রভু ও তাদের

সাম্যবাদের মূল নীতি

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস



অনুচরবন্দ—রাজকর্মচারী, সেনানায়ক আর যাজকদের কর্তৃত্ব। তাদের বর্ণিত পুরনো সমাজে একালের অনাচার ছিল না এটা সত্য, কিন্তু সেই সমাজেও তার নিজস্ব ধরনের অনাচার কিছু কম ছিল না। আর কিছু না হোক, সেগুলি তারা আমদানি করবে। কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার পথে উৎপীড়িত শ্রমিকদের মুক্তির সম্ভাবনাটিও হারিয়ে যাবে।

৩) সর্বহারা শ্রেণি প্রকৃত বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করেছে দেখলেই, এই সমাজতন্ত্রীদের আসল মনোভাব প্রকট হয়ে পড়ে। তখনই তারা সর্বহারা শ্রেণির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে জোট বাঁধে।

সমাজতন্ত্রীদের দ্বিতীয় গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সমর্থকদের নিয়ে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, বর্তমান সমাজব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট অনাচারই পাছে এই সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়। তাই তাদের লক্ষ্য হল বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে অটুট রেখে এর আশ্রয়পুঞ্জে জড়িয়ে থাকা অনাচারগুলি দূর করার চেষ্টা করা। এই লক্ষ্য নিয়েই তাদের কেউ কেউ চায় কিছু কল্যাণমূলক ব্যবস্থা চালু হোক, আবার কেউ কেউ ব্যাপক ভাবে সমাজ সংস্কারের কথা বলে। সমাজকে পুনর্গঠন করার নামে, এই ব্যক্তিরা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক কাঠমোটাকে বজায় রাখতে চায়, যার উদ্দেশ্য হল আসলে এই চলতি সমাজটাকেই অটুট রাখা। কমিউনিস্টদের অবিচল ভাবে এই সব বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদের বিরোধিতা করতে হবে। কারণ এরা সাম্যবাদের শত্রুদের সঙ্গে কাজ করছে এবং কমিউনিস্টরা যে সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চায়, তাকেই রক্ষা করতে চাইছে।

সর্বশেষ বা তৃতীয় গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে। ইতিপূর্বে আলোচিত ‘এই বিপ্লবের গতিপথ কী হবে’ (এঙ্গেলস এখানে একটু শূন্যস্থান রেখেছিলেন, খসড়ার ১৮ নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য হিসাবে, সূত্র : ওই) প্রশ্নের জবাবে কমিউনিস্টরা যে সমস্ত কর্মসূচির

কথা বলেছে, তারা এর অনেকগুলিই মানে। কিন্তু এগুলি তাদের কাছে সমাজের সাম্যবাদে উত্তরণের হাতিয়ার নয়। তারা মনে করে এই সব কর্মসূচি যদি বর্তমান সমাজের অনাচার ও মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারে সেটাই যথেষ্ট। এই সমস্ত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরা হয় নিজেরাই সর্বহারা শ্রেণির মানুষ যারা নিজেদের মুক্তির

শর্তগুলি সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট সচেতন নয়, কিংবা তারা পেটিবুর্জোয়া শ্রেণির অন্তর্গত। পেটি বুর্জোয়ারা হল সেই শ্রেণি, গণতন্ত্রের বিজয় অর্জন এবং তার উপর দাঁড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত যাদের স্বার্থ অনেকাংশেই সর্বহারা শ্রেণির সাথে মিলে যায়। তাই সংগ্রামের সময় কমিউনিস্টদের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যত দূর সম্ভব বোঝাপড়া করে চলতে হবে এবং সাধারণ ভাবে অন্তত কিছুকাল তাদের সাথে মিলিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। যত দিন না এই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরা বুর্জোয়া শাসক শ্রেণির সেবায় নিযুক্ত হয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করছে, তত দিন একাজ চলবে। এ কথা অবশ্যই স্পষ্ট যে, মিলিত কর্মসূচিগুলি আদর্শগত পার্থক্য নিয়ে আলোচনাকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না।

প্রশ্ন : এ কালের অন্যান্য রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?

উত্তর : এ ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতিতে পার্থক্য আছে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে, বুর্জোয়া শ্রেণি যেখানে শাসন ক্ষমতায়, সেখানে সাময়িক ভাবে কমিউনিস্টদের স্বার্থের সঙ্গে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের স্বার্থ মিলে যায়। আজ প্রায় সর্বত্র গণতন্ত্রীরা সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করছেন, তারা যত বেশি একাজ করে তত তাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের লক্ষ্য মিলে যায়। তারা যত বেশি করে সর্বহারার স্বার্থকে তুলে ধরবে ততই তারা সর্বহারা শ্রেণির উপর নির্ভরশীল হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ইংল্যান্ডের চার্টিস্টদের কথা। চার্টিস্টরা প্রায় সকলেই শ্রমিক শ্রেণির মানুষ।

তাই তারা গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া বা তথাকথিত র্যাডিক্যালদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে কমিউনিস্টদের কাছাকাছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে একটা গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেখানে যে দলগুলি এই সংবিধানকে বুর্জোয়া শ্রেণির বিরোধিতায় ও সর্বহারার স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে, কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করবে। এর অর্থ হল কমিউনিস্টরা সে দেশের জাতীয় কৃষি সংস্কারকদের সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করবে। সুইজারল্যান্ডে র্যাডিক্যালদের মধ্যে নানা স্বার্থের মিশ্রণ থাকলেও, একমাত্র তাদের সঙ্গেই কমিউনিস্টরা একত্রে কাজ করতে পারে। এদের মধ্যে আবার ভাউড ও জেনেভার র্যাডিক্যালরাই বেশি অগ্রণী।

সব শেষে, জার্মানিতে বুর্জোয়া শ্রেণি ও চরম স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রাম এখনও শুরু হয়নি। যেহেতু বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতায় আসীন না হওয়া পর্যন্ত কমিউনিস্টরা তাদের চূড়ান্ত মোকাবিলা করতে পারে না। তাই নিজেদের স্বার্থেই কমিউনিস্টদের উচিত বুর্জোয়া শ্রেণিকে যথাসম্ভব দ্রুত ক্ষমতায় আসীন হতে সাহায্য করা, যাতে অতি দ্রুতই তাদের ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। সে জন্য রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের কমিউনিস্টদের সাহায্য করতে হবে। কিন্তু তাদের সচেতন থাকতে হবে যাতে তারা বুর্জোয়া শ্রেণির আত্মপ্রবঞ্চনামূলক প্রচারের শরিক না হয়ে পড়ে। বুর্জোয়াদের জয় সর্বহারার কী উপকারে লাগবে সে বিষয়ে মিথ্যা আশ্বাবাণীতে ভুললে চলবে না।

বুর্জোয়া শ্রেণির ক্ষমতা দখল থেকে কমিউনিস্টদের কেবল যেটুকু সুবিধা হতে পারে তা হলঃ ১, কিছু সুবিধা আদায়, যাতে কমিউনিস্টদের নিজেদের আদর্শের সপক্ষে প্রচার চালানো, আলোচনা করা ও নানা আক্রমণের হাত থেকে আদর্শকে রক্ষা করা সহজ হয়। তার মধ্য দিয়ে সর্বহারা শ্রেণিকে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ জঙ্গি এবং সুসংগঠিত শ্রেণিতে পরিণত করা যায়। ২, এটা নিশ্চিত যে, যেদিন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হবে সেদিন থেকেই শুরু হবে বুর্জোয়া এবং সর্বহারার মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ। সেই দিন থেকে থেকে জার্মান কমিউনিস্টদের নীতি ও কৌশল হবে যেখানে ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া শাসকের ভূমিকায় বসেছে, সেই সব দেশের কমিউনিস্টদের অনুসৃত নীতি ও কৌশলের অনুরূপ। (সমাপ্ত)

জাতীয় নেতৃত্বের দুর্বলতাই সাম্প্রদায়িক শক্তিশালীকরণে পুষ্ট করেছিল

১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। ব্রিটিশ এই বিদ্রোহকে সীমাহীন নির্মমতায় দমন করে। যেহেতু বিদ্রোহের বড় অংশের নেতৃত্বে ছিল মুসলিম নবাব এবং জমিদাররা, তাই বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিশেষ ভাবে মুসলিমদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। একমাত্র দিল্লিতেই ২৭ হাজার মুসলমানকে ফাঁস দেওয়া হয়েছিল। বিদ্রোহে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও একতা দেখা গিয়েছিল তা ইংরেজ শাসকদের উদ্ভিগ্ন করে তুলেছিল। তারা বুঝেছিল, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি ভবিষ্যতে তাদের বড় বিপদের কারণ হতে পারে। বাস্তবিক সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে এক দিকে যেমন নবাব রাজা মহারাজাদের হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টার সমাপ্তি ঘটে তেমনি ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে সরাসরি

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তথা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সূচনা হয়। নতুন ব্যবস্থায় ভারত শাসন নীতিতে ব্রিটিশ শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ব্যাংক পরিচালকদের প্রভাব অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। ১৮৫৮ এর আগেকার সময়ের তুলনায় এখন ভারতে ব্রিটিশ সরকার আরও বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : ফিরে দেখা (৪)

রক্ষণশীলদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের বোঝাপড়া

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে হয়, সরকারি সাহায্যে সতীদাহ প্রথা রোধ ও বিধবাবিবাহ আইন চালু রক্ষণশীল সমাজের একটা বড় অংশের মধ্যে ক্ষোভের ইন্ধন জুগিয়েছিল, যা-ও ১৮৫৭-র বিদ্রোহের বিশেষ কারণ। এর পর থেকেই সরকারি কর্তৃপক্ষ রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে দাঁড়ানোর নীতি নেয়। অন্য দিকে সরকার শিক্ষা প্রসারের যতটুকু

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেখান থেকেও পিছিয়ে যায়। সমাজের রক্ষণশীল অংশের সঙ্গে জোট বাঁধার ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এর পর সমাজ সংস্কারকদের সহায়তা করার আগেকার নীতি পরিত্যাগ করে।

আবার এই সময় থেকেই জাতীয়তাবাদী চিন্তারও সূচনা। ভারতবাসী মাত্রেরই যে স্বার্থ এক, এই ভাবনাও এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারাও শিক্ষিত মানুষের মনে যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক চিন্তার জন্ম দেয়। শিক্ষিত শ্রেণি বুঝতে সক্ষম হয় যে, ভারত যত দিন সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণে থাকবে তত দিন অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা নেই। ভারতে শিল্প বিকাশেরও আশা নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকাশে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারের ক্ষেত্রে

সাতের পাতায় দেখুন

বৈধ ভোটারদের নাম দ্রুত তালিকাভুক্তির দাবিতে রাজ্য জুড়ে পথে নেমেছেন নাগরিকরা

কলকাতা : ৮ সেপ্টেম্বর রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে আবার বিক্ষোভ দেখাল ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি। এসআইআর-এ বাদ পড়া লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম দ্রুত তালিকাভুক্তির দাবিতে সমিতির নেতৃত্বে এ দিনও পথে নামলেন হাজার হাজার মানুষ। মিছিল করে গিয়ে তাঁরা নথিপত্র-সহ ডেপুটেশন দিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও কলকাতায় এ দিন সমিতির নেতৃত্বে দুটি বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন বহু মানুষ। দক্ষিণ কলকাতায় প্রায় তিন শতাধিক মানুষের মিছিল হাজার মোড় থেকে আলিপুরে যায়। সেখানে ডিইও ও ডিএম অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উত্তর কলকাতার ফেয়ারলি লঞ্চ ঘাট থেকে আর একটি মিছিল নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে যায়। সেখানেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রশাসন অবিলম্বে উপযুক্ত পদক্ষেপ না করলে লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নেমে গণতান্ত্রিক অধিকার তথা ভোটাধিকার সুরক্ষার জন্য তীব্র আন্দোলনে সামিল হবে।

বেলদা : প্রায় এক বছর হতে চলল এসআইআর-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। আর কবে ট্রাইবুনাল

তাঁদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেবে— সেই ক্ষোভে ফুঁসছেন ভুক্তভোগীরা। ৯ সেপ্টেম্বর বেলদা পরাগ ভবনে ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর (দক্ষিণ) সাংগঠনিক জেলা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বানে অনুষ্ঠিত গণকনভেনশনে সেই ক্ষোভের আঁচ পাওয়া গেল। কনভেনশনে শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন। মহিলাদের উপস্থিতি



ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রধান আলোচক ছিলেন অধ্যাপক দেবশিশু আইচ। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন শিক্ষক প্রদীপ কুমার দাস।

বহু বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক দেবশীষ আইচ, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার দ্বারা সমস্ত বৈধ ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত না করা হলে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করার ইশিয়ারি দেন। কনভেনশন থেকে প্রদীপ কুমার দাসকে সভাপতি, পরেশ

বেরাকে সহসভাপতি এবং স্বদেশ পড়্যা ও সেখ হামিদুল মহম্মদকে যুগ্ম সম্পাদক করে ২০ জনের পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

গোসাবা : নাম বাদ পড়া বৈধ নাগরিকদের নাম অবিলম্বে ভোটার তালিকায় তোলা এবং তাঁদের কোনও সরকারি পরিষেবা থেকে বাদ না দেওয়ার দাবিতে ১০ সেপ্টেম্বর ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির আহ্বানে দক্ষিণ ২৪



পরগণায় গোসাবা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান ভুক্তভোগী মানুষ।

চাপড়া : নদিয়া জেলায় ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির চাপড়া শাখার পক্ষ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর সমস্ত ডি লিটেড ও ট্রাইবুনালে বিচারাধীন বৈধ নাগরিকদের অতি দ্রুত ভোটার তালিকায় নাম তোলার দাবিতে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয়



সমিতির জেলা কমিটির বিশিষ্ট সদস্য মশিকুর রহমান ও বিশিষ্ট আইনজীবী মোজাম্মেল

হোসেন মণ্ডলের নেতৃত্বে ছয়জনের প্রতিনিধিদল বিডিওর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। তাঁদের দাবি, সমস্ত বৈধ নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে হবে, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বিচারাধীন ভোটারদের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে, জেলায় জেলায় ট্রাইবুনাল গঠন করতে হবে, ডি লিটেড ও বিচারাধীন ভোটারদের নাগরিক পরিষেবা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না, ডি লিটেড ভোটারদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে হোল্ডিং সেন্টারে তুলে নিয়ে যাওয়া চলবে না, ট্রাইবুনালের বিচার প্রক্রিয়ার ফলাফলের তালিকা প্রতি ১৫ দিন অন্তর বিডিও অফিসে টাঙাতে হবে, ইত্যাদি। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন মধুমিতা কুণ্ডু, হুমায়ুন শেখ, আলমগীর শেখ, শামিম শেখ প্রমুখ।

মেদিনীপুর : মেদিনীপুর শহরের রেডক্রস সোসাইটি হলে ৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর (উত্তর) জেলা কনভেনশন। বিভিন্ন এলাকা থেকে দুই শতাধিক ভুক্তভোগী ভোটার এবং আন্দোলনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সমিতির রাজ্যস্তরের নেতা

অজয় বায়েন। সভাপতিত্ব করেন মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা দীপক বসু। কনভেনশন থেকে দীপক বসুকে সভাপতি, দেবশিশু আইচকে সম্পাদক এবং মানস রানাকে কোষাধ্যক্ষ করে

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান : শ্বেতপত্রের দাবিতে কনভেনশন

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণে অবিলম্বে শ্বেতপত্র প্রকাশ, তদারকি কমিটি গঠন ও অবিলম্বে কাজ শুরুর দাবিতে ১৩ আগস্ট ঘাটালের মহকুমা শাসক ও সেচ দপ্তরে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি স্মারকলিপি দেয়।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবশীষ মাইতি বলেন, সংস্কারের শ্লথগতির ফলে নদীগুলিতে জলস্তর বেড়ে কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত

হয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও আজ পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি।

এ দিনই অল্পপূর্ণা আর্কেডে দেবশীষ মাইতির সভাপতিত্বে এক কনভেনশন হয়। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমিটির অফিস সম্পাদক কানাই লাল পাখিরা। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমিটির উপদেষ্টা ঘাটালের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গৌরীশংকর বাগ, অঞ্জন জানা, পুষ্প বাগ প্রমুখ।

স্বাস্থ্যকর্মী ও সিএইচজি-দের বিক্ষোভ

সরকারের বদল হল, কিন্তু সরকারি বঞ্চনার বদল নেই। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যকর্মী ও সিএইচজি-রা মাসিক সাম্মানিক পান ৪০০ টাকা। টিডিরা পান মাসিক ৫৫০ টাকা। এভিডি কর্মীরা দৈনিক ৯০ টাকা ভিত্তিতে মাসে পান মাত্র ৩৬০ টাকা।

সাম্মানিক বৃদ্ধি করে বাঁচার মতো অর্থ, ৫ লক্ষ টাকা রিটার্নসমেন্ট বেনিফিট দেওয়ার অর্থ দফতরের আদেশ কার্যকর করা, ৮.৩৩ শতাংশ হারে পূজা

বোনাস ইত্যাদি দাবিতে ৯ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্যভবনে ডিএইচএস-এর কাছে নিম্নলিখিত দাবিগুলি নিয়ে ডেপুটেশন দেন বঞ্চিত কর্মীরা। কর্মসূচিটিতে নেতৃত্ব দেন এআইইউটিইউসি রাজ্য কমিটির সদস্য নিখিল বেরা ও সুস্মিতা মাহাতো। স্বাস্থ্য ভবনের বাইরে কয়েক হাজার কর্মীর বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস, স্কিম ওয়ার্কস ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদিকা

ইসমত আরা খাতুন এবং বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা। স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে কর্তৃপক্ষের কাছে তা জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন ইউনিয়নের মুখ্য সংগঠক সমরেন্দ্রনাথ মাজী।



শ্রমিকের স্বীকৃতি দাবি পরিচালিকা সমিতির

পরিচালিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, নির্দিষ্ট মজুরি ও সবেতন ছুটি, পরিবারগুলিকে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত কিনামূল্যে বিদ্যুৎ ইত্যাদি দাবিতে সারা বাংলা পরিচালিকা সমিতির নেতৃত্বে ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার ওয়াই চ্যানেলে বিক্ষোভ দেখান পাঁচ শতাধিক পরিচালিকা। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির সম্পাদক জয়শ্রী চক্রবর্তী, অফিস সম্পাদক তনুশ্রী শাসমল, শিখা দাস, নীতিকণা মাইতি, পূজা প্রামাণিক প্রমুখ। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসির রাজ্য



সহসভাপতি নন্দ পাত্র। এরপর শ্রমমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন পার্বতী পাল, শোভা মাহাত, ভবানী চক্রবর্তী, রূপা মহন্ত। শ্রমমন্ত্রী দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং বিবেচনার আশ্বাস দেন।

ওয়াটার ক্যারিয়ার, সুইপারদের বিক্ষোভ

সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, ৫ লক্ষ টাকা অবসরকালীন অনুদান, ১৯৯৯ সাল থেকে সমস্ত



বকেয়া প্রদান সহ ৬ দফা দাবিতে ৮ সেপ্টেম্বর এআইইউটিইউসি অনুমোদিত 'সারা বাংলা ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপার (কর্মবন্ধু) সমন্বয় সমিতি'-র ডাকে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সহস্রাধিক

ওয়াটার ক্যারিয়ার সমবেত হয়ে সুসজ্জিত মিছিল করে কলকাতার ওয়াই চ্যানেলে সমাবেশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থ সচিবের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সমরেন্দ্র নাথ মাজী, নিখিল বেরা ও প্রভাত পণ্ডিত। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। তিনি সকল কর্মীকে এই ইউনিয়নের নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ হয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

গণদ্যাবী পড়ুন ও গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - ১৫০ টাকা সডাক - ১৬৫ টাকা

‘যোগ্য’ শিক্ষকদের চাকরি ফিরবে কবে?

স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের প্যানেলের শিক্ষক শিক্ষাকর্মীরা যেন এখন পলিটিক্যাল ইস্যু। যে যখন ক্ষমতায় আসে ইচ্ছা মতো এঁদের নিয়ে খেলতে শুরু করে। কোর্টও পিছিয়ে থাকে না। সেই খেলায় এঁদের জীবন জেরবার। আর কত দিন চাকরি থাকবে, ভবিষ্যতই বা কী হবে, ভেবে আকুল হাজার হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা। চাকরি হারা যোগ্য শিক্ষাকর্মীদের জীবনও সম্পূর্ণ অন্ধকারে। কেউ কেউ বলছেন যে, এঁদের জীবন এমন শব্দেহের মতো, যা কবর থেকে তুলে বারবার পোস্টমর্টেম করা হচ্ছে। নিজেদের যোগ্যতায় চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও সরকারের বদান্যতা ও কোর্টের দয়ায় গত ৩১ আগস্ট তৃতীয় বারের জন্য ৩১ মে ২০২৭ সাল পর্যন্ত তাঁদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি পেল।

এই মানুষগুলির দুর্গতির ইতিহাস সকলেরই প্রায় জানা। স্কুল সার্ভিস কমিশন ২০১৬-এর প্যানেলের নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি করেছিল বিগত তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। ২৫ হাজার ৭৯২ জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরির এই প্যানেল প্রথমে বাতিলের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। পরবর্তী সময়ে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। কোর্টের নির্দেশে রঞ্জিত বাগ কমিটি বা সিবিআই তদন্ত চালালেও ‘চাল থেকে কাঁকর বাছা সম্ভব নয়’ বলে সুপ্রিম কোর্ট ৩ এপ্রিল ২০২৫ এই প্যানেল সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে। এসইউসিআই(সি) এই বিচারের প্রহসন দেখিয়ে বলেছিল, অযোগ্যকে বাছতে না পেরে যোগ্যদেরও বলি দেওয়া হল। কোর্ট নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকারকে নতুন করে পরীক্ষা নিয়ে আনটেন্টেড (অকলঙ্কিত) শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নতুন ভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত করতে হবে এবং এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেবল আনটেন্টেড শিক্ষকদের চাকরি বহাল থাকবে। কোর্ট শিক্ষাকর্মী গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বেশি দুর্নীতি হওয়ায় সবার চাকরি বাতিল করে দেয়। এঁদের এক্সটেনশনও দেওয়া হয়নি।

প্রসঙ্গত এ বারের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে মোট তিন বার আদালতের আবেদনের ভিত্তিতে মধ্য দিয়ে চাকরির এক্সটেনশন হল। বিগত সরকারের আমলেও দু-বার, বর্তমান সরকারে একবার।

প্রশ্ন উঠেছে, এই অকলঙ্কিত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কী দোষে শাস্তি পেতে হচ্ছে? এঁদের নিজেদের কোনও দোষ নেই। দোষী চিহ্নিত হয়েছে সরকার। বিচারব্যবস্থা এদের সুবিচার দেয়নি। তা হলে বিনা দোষে কেন এই শাস্তিভোগ? শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি হলেও, শিক্ষাকর্মীদের জীবন ধারণ করা দিনে দিনে কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে। বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে এঁদের প্রায় দেড় বছরের বেতনহীন জীবন কতখানি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

অকলঙ্কিত বা আনটেন্টেড শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি সরকারের দয়ার দানে পরিণত হয়েছে। বাগ কমিটি বা সিবিআই বলছে এঁরা আনটেন্টেড। তা হলে এঁদের অনিশ্চয়তার পথে বারবার ঠেলে দিচ্ছে কেন সরকার?

সকলেরই জানা এই প্যানেলের শিক্ষক

শিক্ষিকারা কেউ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ড মেডেলিস্ট কেউ বা পিএইচডি ডিগ্রিধারী অথবা নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুণী। বিগত সরকারের আমলা নেতা-মন্ত্রীরা এঁদের জীবনকে কলঙ্কিত করেছে। শিক্ষকতার মতো মর্যাদাময় পেশায় নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এঁদের মান সম্মান ধূলয় মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এই প্যানেলের ১২ জন মারা গিয়েছেন প্রচণ্ড হতাশায় অসুস্থ হয়ে। পরিবারগুলি ধুঁকছে। তাদের দিকে চোখ ফেরাচ্ছে না নতুন সরকারও। অন্য দিকে দুর্নীতিকারী নেতা আমলা মন্ত্রীরা একে একে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে।

এই প্যানেলের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে ঘৃণ্য রাজনৈতিক খেলাও কম হচ্ছে না। বিগত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এদের রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বর্তমান বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, তৎকালীন বিরোধী দলনেতা বারে বারে এই চাকরিহারাদের আন্দোলনে গিয়ে বলেছেন— রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সাত দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে ওএমআর সিট জমা করে এক মাসের মধ্যে যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে দেবেন। তা যে আদতে ‘জুমা’ প্রত্যেকেই তা বুঝছেন। যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এড়িয়ে এখন নেতারা বলছেন কোর্টের রায় মেনে নিয়োগ হবে। এই দ্বিচারিতা কতদিন চলবে?

কোর্টের নির্দেশে স্কুল সার্ভিস কমিশন ২০২৫ বা এসএলএসটি টু নিয়োগের ফল প্রকাশ হলেও নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে। এই নতুন প্যানেলে যোগ্যদের একটা বড় অংশ মেধা তালিকায় এসে নতুন চাকরির অপেক্ষায় যেমন আছেন, আবার একেবারে নবীন চাকরি প্রার্থীদের মেধা তালিকায় নাম এলেও চাকরির অপেক্ষায় দিন গুনছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া বারবার পিছিয়ে যাওয়ার কারণে হতাশ হয়ে পড়ছেন তাঁরাও। অন্য দিকে নতুন প্যানেলে পাস করতে পারেননি এমন যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যাও কম নয়। প্রশ্ন উঠছে তাঁরা যাবেন কোথায়? কী হবে তাঁদের নিয়োগ সমস্যার সমাধান?

শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার কারণে সব থেকে বেশি ক্ষতি হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের। সে ক্ষতি নীরব এবং তা অপূরণীয়। অথচ রাজ্য সরকারের এ নিয়ে ভাবার ফুরসত নেই। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া সহ নানা কারণে সরকারি শিক্ষাক্ষেত্র এখন বিপন্ন। সাধারণ অভিভাবকদের কাছে গুরুত্ব হারাচ্ছে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা। ফলে বেসরকারিকরণের পথ প্রসারিত হচ্ছে। সরকার কি এর মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে শিক্ষার বেসরকারিকরণেরই রাস্তা করে দিচ্ছে?

ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় আসার সময় দেওয়া ১০ হাজার ৩২৩ জনের চাকরি পাকা করার প্রতিশ্রুতি পালন করেনি বিজেপি সরকার। এ রাজ্যে ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চান না সাধারণ মানুষ। তাঁদের দাবি, শিক্ষা বাঁচাতে, যোগ্য শিক্ষকদের বাঁচাতে নতুন সরকার অতি দ্রুত তৎপর হোক। অকলঙ্কিত যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা যে ভাবে আজও আন্দোলনে যুক্ত রয়েছেন, তা অভিনন্দনযোগ্য। সরকার যতই ছলচাতুরি করুক, লড়াই আন্দোলন সঠিক নেতৃত্বে, সঠিক পথে চললে জয় একদিন আসবেই।

এআইএমএসএস রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি জেলায় জেলায়



বহরমপুরে প্রচার মিছিল

২৬-২৭ সেপ্টেম্বর এআইএমএসএস-এর ৮ম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কোচবিহার শহরে। নারীর সুরক্ষা সমানাধিকার সমমর্যাদা এবং নারী নির্যাতন, নারীপাচার, ধর্ষণ, খুন বন্ধ ও মদ মাদক জুয়া স্ট্রাটো নিষিদ্ধ করার দাবিতে রাজ্য জুড়ে এই সংগঠন আন্দোলন গড়ে তুলছে। আন্দোলন আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং রাজ্য সম্মেলন সফল করতে জেলায় জেলায়, আঞ্চলিক ও ব্লক স্তরের সম্মেলনগুলির মাধ্যমে কয়েক হাজার মহিলা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বদলি বিল তীব্র বিরোধিতায় এস ইউ সি আই (সি)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তরুণকান্তি নস্কর ১০ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

আজ ‘পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধন বিল ২০২৬’ যা বিধানসভায় রাজ্য সরকার আইনে পরিণত করল তা কার্যকরী হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছিল মুক্ত জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান হিসাবে, তার জন্য প্রয়োজন বাইরের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত পরিপূর্ণ স্বাধিকার। এই আইনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার শব্দটি এ রাজ্যের অভিধান থেকে মুছে যাবে।

ওই বিলের উদ্দেশ্য হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘এক রাজ্য, এক শিক্ষা’ ব্যবস্থা চালু করা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গড়ে উঠেছে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বৌদ্ধিক বিকাশ ও সামাজিক প্রয়োজনে। যেমন যাদবপুর গড়ে উঠেছিল, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে বিদেশি দ্রব্য ও বিদেশি শিক্ষা বর্জনের আবহে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল অন্যান্য বিষয়ের সাথে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের চর্চার জন্য। অন্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলিও তাই। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারি দফতরে পরিণত করা হল। তাঁরা জানেন না, সরকারের রাজনৈতিক কাঠামোতে যা চলে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থায় তা চলে না। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল শিক্ষণের জায়গা নয়, গবেষণার জায়গা। গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকদের বদলি করলে গবেষণা বিপর্যস্ত হবে। উপরন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পদের অনুমোদন ইউজিসি দেয় এবং সেই বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই তা দেয়।

এমনকি শিক্ষকের স্পেশালাইজেশন ও কোয়ালিফিকেশন তারাই নির্দিষ্ট করে দেয়। সেই শিক্ষককে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি করলে সংশ্লিষ্ট দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনওটিই লাভবান হবে না। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক বা অন্য পদ নেই তা নতুন করে তৈরি করে বা শূন্যপদে নিয়োগ করুক সরকার। এ ছাড়া বিরোধী মতের যে কোনও শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও আধিকারিকদের চূপ করিয়ে দেওয়ার জন্য বদলিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হতে পারে।

সরকার বলছে যে, পুরনো ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নেই, তাই বদলি করতে হবে। এতে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অসুবিধায় পড়বে। সরকারের উচিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ সমেত অন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা। সব দেখে মনে হয়, তাঁদের মাথায় আছে যাদবপুরের ছাত্র-শিক্ষক-আধিকারিক-শিক্ষাকর্মী নিয়ে যে কাঠামোটি আছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাকে ভেঙে দিয়ে শাসক দল ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিতে ভরিয়ে দেওয়া। ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকারের উদ্যোগে যাদবপুরকেন্দ্রিক একের পর এক কর্মসূচি, বিশেষ করে গত ৯ সেপ্টেম্বর এমনকি নাগা সন্ন্যাসীদের যে মিছিল যাদবপুরে হয়েছে তা থেকে এই ধারণা দৃঢ় হচ্ছে। যে রাজ্য শিক্ষায় পিছিয়ে সেই রাজ্যের সরকার র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়টিকে এই ভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে শুধু নয়, সমগ্র উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে এই আইন কার্যকর করা থেকে বিরত হওয়ার দাবি করছি।

এআইডিএসও রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ১০ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে এই বিল বাতিলের দাবি জানান।

পাঠকের মতামত

শুধু ত্রাণ নয়

চাই স্থায়ী নদীবাঁধ

ভরা বর্ষায় বাড়ছে নদীর জলস্তর। ভাঙছে ভূতনীর বাঁধ, হারিয়ে যাচ্ছে ভিটেমাটি, ভাঙছে মন। তারপরেও বেঁচে থাকার লড়াই চলছে ভূতনীবাসীর।

গঙ্গা ভাঙন মালদার ভূতনীবাসীর এক জলন্ত সমস্যা। গত তিন দশক ধরে তারা নতুন দিনের স্বপ্ন নিয়ে নির্বাচনে সামিল হয়, কিন্তু ভাঙন প্রতিরোধের সুনির্দিষ্ট কোনও কর্মসূচি তারা দেখতে পায় না প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ভাঙন প্রতিরোধের নামে ফি বছর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও তা জলে যাচ্ছে। এবারেও যে অর্থ ব্যয় করে প্রকোপাইনের বাঁশ, বালির বস্তা ফেলে ভাঙন রোধের চেষ্টা করা হচ্ছে, তার সবই আপাতত ভাঙনের কবলে।

দিনের পর দিন সরকারি নেতারা মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে চলেছেন ভাঙন-দুর্গতদের। স্থানীয় মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়করা সত্যিই যদি ভাঙন প্রতিরোধের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিতেন তা হলে এই হাজার হাজার অসহায় মানুষকে নিজেদের ভিটেমাটি, জমি, সহায়-সম্পত্তি হারিয়ে দিনের পর দিন জলবন্দি অবস্থায় থাকতে হত না। শুখা মরশুমে শীতঘুমে থেকে ভরা বর্ষায় ভাঙা বাঁধে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ভোটের অঙ্কের হিসাব রাখতে আর বিপন্ন মানুষদের বিভ্রান্ত করতে নেতা-মন্ত্রীরা যথেষ্ট পটু।

চার মাস হয়েছে নতুন সরকার এসেছে। তাদের পক্ষ থেকে স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সমাধান কতটা মিলবে সেটা সময়ই বলবে। তবে ভূতনীবাসীরা ইতিমধ্যেই আওয়াজ তুলেছে— শুধু ত্রাণ নয়, চাই সুউচ্চ মজবুত ও স্থায়ী নদীবাঁধ। তা না হলে মালদার মানচিত্র থেকে দ্রুত মুছে যাবে ভূতনি ও তার আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং পথে বসবে হাজার হাজার মানুষ।

বিটু দেবনাথ

ইংলিশ বাজার, মালদা

স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তার কাছে

ডেপুটেশন এআইডিএসও-র

সম্প্রতি ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে পরীক্ষায় দুর্নীতি আটকানোর নাম করে মেয়েদের দেহ তল্লাশি করানো, অশালীন ব্যবহার, হিজাব ও অন্তর্বাস খোলানোর মতো গুরুতর অভিযোগ আসে। অথচ কদিন আগেই বর্ধমান মেডিকেল কলেজে কিছু ছাত্রকে পাশ করানোর জন্য কর্তৃপক্ষের মধ্যে থেকেই চাপ দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছিল তার কোনও তদন্ত হয়নি। এই ঘটনার দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত এবং সব রকমের অবৈধ হস্তক্ষেপ, বেনিয়ম বন্ধ করে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করার দাবিতে ১০ সেপ্টেম্বর এআইডিএসও মেডিকেল ইউনিট, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তার কাছে প্রতিনিধি ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

গত ২ সেপ্টেম্বর নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে এবিভিপি ও বিজেপি-র বহিরাগত দুষ্কৃতীদের দ্বারা কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রী ও জুনিয়র ডাক্তারদের উপর আক্রমণ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে কার্যত দুষ্কৃতীদেরই প্রশ্রয়দানের ঘটনারও প্রতিবাদ জানানো হয়। কলেজের গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার জন্য দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি করা হয়। স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা অবিলম্বে বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, স্বাস্থ্য সচিব সহ রাজ্য মানবাধিকার কমিশন এবং রাজ্য মহিলা কমিশনের কাছেও ডেপুটেশনের প্রতিলিপি পাঠানো হয়।

শুধু সিএমশ্রী নয়, সমস্ত স্কুলেরই হাল ফেরাক সরকার

সেভ এডুকেশন কমিটি

গত ৫ সেপ্টেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ‘সিএমশ্রী’ স্কুল তৈরির প্রস্তাব দিয়ে রাজ্যের সামান্য কয়েকটি স্কুলকে মডেল স্কুলে উন্নীত করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সারা অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ কান্তি নস্কর ৬ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৬০০টি স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নতি করে সেগুলিকে মডেল স্কুলে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কেন্দ্রের পিএমশ্রী প্রকল্পের অনুকরণে এই স্কুলগুলিকে তিনি ‘সিএমশ্রী’ স্কুল বলতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘রাজ্যে ১৯ হাজার স্কুল আছে যেখানে স্বাধীনতার ৮ দশক পরেও ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই।’ বাস্তবে এমন স্কুলের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। তাঁর দেওয়া

তথ্য যদি সত্য হয় তাহলে ৬০০ স্কুলকে মডেল স্কুলে উন্নীত করলে বাকিগুলোর দশা কী হবে? সেগুলোর হাল কি আরও খারাপ হতে থাকবে? আসলে কেন্দ্রের যে ‘পিএমশ্রী’ প্রকল্প তিনি অনুসরণ করছেন তাতে সারা দেশের ২৮.৮ কোটি স্কুল-শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ২০ লক্ষ অর্থাৎ ০.৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়। অন্য দিকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে তিনি যত সংখ্যক ভগ্নস্বাস্থ্য সম্পন্ন স্কুলের কথা বলেছেন তার মাত্র ৩ শতাংশ স্কুলের ভাগ্য ফিরবে। এই বৈষম্য সমর্থনযোগ্য নয়।

তিনি দাবি করেন, সামান্য কয়েকটি স্কুলকে মডেল না করে মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা করুন। তাতে রাজ্যের শিক্ষার মানের খানিকটা হলেও উন্নতি হবে।

রানাঘাটে রক্তদান শিবির

ও স্বাস্থ্য সেমিনার

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন নদিয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৩০ আগস্ট রানাঘাট শহরের

বি সি রায় মেমোরিয়াল হলে রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। রক্তদান শিবির উদ্বোধন করেন ডাঃ সজল বিশ্বাস। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ অপূর্ব কুমার রায়। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ তজবিরুল ইসলাম, ডাঃ নীলাদ্রি শেখর পাল, ডাঃ দেবব্রত বিশ্বাস, ডাঃ তীর্থঙ্কর দেবনাথ, আইনজীবী মিলন চ্যাটার্জী ও ডাঃ সত্যজিৎ রায়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বদলি বিল

সমালোচক বা ভিন্নমতাবলম্বীদের সংহার করাই এখন বিজেপির রাজনৈতিক অগ্রাধিকার।

এ-রাজ্যের মানুষ বলছে রাজ্য সরকার ও তার পরিচালক বিজেপি চরম রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিয়ে যাদবপুরের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের ভয় দেখানো ও শাস্তি প্রদানের হুমকি দিতে বদলি-সংক্রান্ত এই বিল বিধানসভায় পাস করিয়েছে। সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে স্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারি দপ্তরে পরিণত করতে চাইছে। এর ফলে শিক্ষকদের অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন খর্ব হবে। শিক্ষক যদি মনে করেন যে সরকারের নীতির সমালোচনা বা স্বাধীন মতপ্রকাশ তাঁর বদলির কারণ হতে পারে, তবে তা তাঁর মুক্ত ও অবাধ অ্যাকাডেমিক চর্চার পথে বাধা হবে। যার পরিণামে শিক্ষা ও গবেষণার সৃষ্টিশীলতা ও উৎকর্ষ বিনষ্ট হবে। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হবে। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে যৌথ গবেষণা ও অ্যাকাডেমিক সহযোগিতা দীর্ঘদিনের প্রচলিত ব্যবস্থা। কিন্তু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বদলির নজির এ দেশ বা বিদেশেও নেই।

ডবল ইঞ্জিন সরকার শিক্ষার উৎকর্ষের ধূয়া তুলে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ক্রমাগত রংগ্ন করে দিয়ে জনস্বার্থবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করতে নানা দমনমূলক অস্ত্র তৈরি করছে। প্রতিবাদী শিক্ষকদের বেছে বেছে বদলির ভয় দেখানোর সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে, ছাত্র আন্দোলন দমনে পুলিশ-প্রশাসন ও সরকারি দল-আশ্রিত বহিরাগত শক্তির ব্যবহার নিয়ে অভিযোগ উঠছে, নেতা-মন্ত্রীরা ক্যাম্পাসের ভিতর ও বাইরে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিক শক্তিপ্রদর্শনের ক্ষেত্র করে তুলছেন। প্রতিবাদী ছাত্র-শিক্ষকদের ‘দেশদ্রোহী’ তকমা দেওয়া এবং তাঁদের বিরুদ্ধে নানা দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা এই বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণেরই অংশ।

ফলে, এই বিলের সঙ্গে শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন বা জনস্বার্থের সম্পর্ক নেই। শিক্ষার উৎকর্ষের কথা বলে যে শরীরী ভাষা ও শব্দবন্ধ ব্যবহার করে বিলটি পাশ করানো হয়েছে এবং নেতা-মন্ত্রীদের বক্তব্যে যে আগ্রাসী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তাতে আশঙ্কা জোরালো হয় যে এই আইন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য ‘পানিশমেন্ট ট্রান্সফার’-এর একটি কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠবে। পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিবর্তে বাধ্যতামূলক কেন্দ্রীভূত বদলি-ব্যবস্থা চালু করে সরকার উচ্চশিক্ষায় সরকারি নিয়ন্ত্রণের এক বিপজ্জনক নজির তৈরি করল।

একের পাতার পর

গবেষণার উপরেও তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। একজন শিক্ষক যদি একটি গবেষণা প্রকল্পের দায়িত্বে থাকেন এবং তাঁর অধীনে গবেষক-ছাত্ররা কাজ করেন, তাঁকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হলে সেই কাজের ধারাবাহিকতা কীভাবে বজায় থাকবে? নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ধরনের ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি বা গবেষণার সুযোগ থাকবে কি না, তার নিশ্চয়তাই বা কোথায়? গবেষণার জন্য ব্যবহৃত অনেক সরঞ্জাম ও পরিকাঠামো মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ। ফলে শিক্ষক বদলির অভিঘাত শুধু কর্মস্থল পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তাঁর তত্ত্বাবধানে চলা গবেষণা প্রকল্প ব্যাহত হবে, গবেষক-ছাত্রদের কাজ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে এবং বহু বছরের গবেষণার ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে।

তাই আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বদলিকে শিক্ষার উৎকর্ষের উপায় হিসেবে সরকার যেভাবে দেখাতে চাইছে, তা চূড়ান্ত বিভ্রান্তিকর। বদলি করলে রাজ্যে শিক্ষকসংখ্যা বাড়ে না, এক জায়গার ঘাটতি কমিয়ে অন্য জায়গায় ঘাটতি তৈরি হয়। বিলে মানবসম্পদের সুযম বণ্টন সুনিশ্চিত করার জন্য ‘প্রশাসনিক কারণে’ বদলির যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, সেটিও অসার। কারণ বদলি-ব্যবস্থা ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যৌথ গবেষণা, শিক্ষক-ছাত্র বিনিময়, সেমিনার, কর্মশালা এবং অ্যাকাডেমিক সহযোগিতা বহুদিন ধরেই চলে আসছে। শিক্ষার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজন, যেখানে ঘাটতি আছে সেখানে নতুন ও যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, শূন্যপদ পূরণ, নতুন পদ সৃষ্টি এবং পর্যাপ্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা— এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সরিয়ে দেওয়া নয়।

প্রসঙ্গত, গত ১৯ ও ২০ আগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার-আশ্রিত বিজেপি-এবিভিপি সংগঠিত হামলা এবং তারপর থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ও ক্যাম্পাসের ভিতরে মুখ্যমন্ত্রী, এবিভিপি এবং বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে লাগাতার উচ্ছানিমূলক কর্মসূচি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে বহিরাগত রাজনৈতিক সমাবেশ ও শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার রাজ্যের সাধারণ মানুষ মেনে নেয়নি। এই এবিভিপি সমেত বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তাগুবে সরকার যারপরনাই নিন্দিত হয়েছে। ব্যাকফুটে থাকা সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় চরম প্রতিহিংসার পথ বেছে নিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাম্প্রতিক মন্তব্যে তা স্পষ্ট। তাঁর কথায়, “হয় ওরা থাকবে, নয় আমরা থাকব। যথেষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে আর কিছু থাকবে না।” এই ‘ওরা’দের, অর্থাৎ আরএসএস-বিজেপি-এবিভিপি নীতি ও কার্যকলাপের

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : ফিরে দেখা

তিনের পাতার পর

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সংবাদপত্র। দেশীয় এই সব সংবাদপত্রে যেমন সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের কাজকর্মের সমালোচনা করা হত, তেমনই স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র, শিল্পবিকাশ প্রভৃতি নিয়ে জনমত গড়ে তোলা হত। বাংলা থেকে প্রকাশিত হত হিন্দু পেট্রিয়ট, অমৃতবাজার পত্রিকা, ইন্ডিয়ান মিরর, বেঙ্গলি, সোমপ্রকাশ ও সঞ্জীবনী। তেমনই মুম্বই, চেন্নাই, অন্ধ্র, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব থেকেও বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ পেত। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাগুলি, থিয়েটার এবং গোপন বৈপ্লবিক সমিতিগুলিও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধ্বংসের চেষ্টা শুরু ব্রিটিশের

১৮৭০-এর পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যতই প্রসারিত হতে থাকে ততই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ধ্বংস করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ বাড়িয়ে তোলাকে ভারতে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার নীতি হিসাবে গ্রহণ করে। এই লক্ষ্য নিয়েই ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়। মুসলমান ভূস্বামী ও নব্য-শিক্ষিত মুসলমানদের নিজেদের দলে টেনে আনার পথ নেয়।

সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে মুসলমান সমাজের গরিষ্ঠ অংশে হতাশার ছায়া নেমে আসে। যেহেতু ব্রিটিশরা মূলত মুসলিম শাসকদের হাত থেকেই ক্ষমতা কেড়ে নেয়, তাই ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তাদের নিয়ে আসা শিক্ষা সহ আধুনিকতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই অনগ্রসরতা মুসলিম সমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা ছিল নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষাগত দৈন্যের কারণে মুসলমানরা তা থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। আলিগড়ের সৈয়দ আহমেদ খানের মতো কিছু নেতা ছিলেন ব্যতিক্রম। স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি মুসলমান সমাজের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হন। এক সময় তিনি ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসারের জন্য সায়েন্টিফিক সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধতা থেকে সচেতন দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। প্রথম জীবনে তিনি বলেছিলেন, “... হিন্দু বা মুসলমান আখ্যা, কে কোন ধর্মাবলম্বী সেটাই চিহ্নিত করে দেয়। ধর্মের নাম আলাদা হলেও হিন্দুই হোক, বা মুসলমানই হোক, এমনকি এ দেশে বসবাসকারী খ্রিস্টানরাও এক হিসেবে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত।” তিনিই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ব্রিটিশের বিভাজনের রাজনীতির আবর্তে পড়ে সঙ্কীর্ণতাবাদী তথা রক্ষণশীল হয়ে ওঠেন। তিনি ঘোষণা করেন যে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক স্বার্থ এক তো নয়ই বরং বিপরীত। তিনি তাঁর অনুগামীদের ব্রিটিশ রাজের প্রতি একান্ত অনুগত থাকার পরামর্শ দিতেন। এমনকি ১৮৮৬-তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি এর বিরোধিতা করেন। সৈয়দ আহম্মদ খান এই মত প্রচারে ব্রতী হন যে, ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটলে বা ব্রিটিশ-

শাসন দুর্বল হয়ে উঠলে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের অধীনতা স্বীকার করতে হবে। তাঁর এই বক্তব্যকেই পরবর্তী সময়ের মুসলিম লিগ নেতারা বিভেদপন্থী রাজনীতির প্রসারে কাজে লাগিয়েছিল।

সাধারণত প্রতিক্রিয়াশীল বড় বড় ভূস্বামীরাই মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব দিত। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে জমিদার বা ভূস্বামী শ্রেণি নিজেদের কায়মি স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই সে সময় ব্রিটিশ শাসনের উগ্র উৎসাহী সমর্থকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উচ্চশিক্ষা বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে নব্যশিক্ষিত হিন্দু ও এই সম্প্রদায়ের উদীয়মান ব্যবসায়ী শিল্পোদ্যোগী শ্রেণি জনসাধারণের নেতৃত্ব দখল করে, জমিদার শ্রেণির চেয়ে সাধারণ মানুষের কাছে এই শিক্ষিত শ্রেণির মর্যাদা বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের অবস্থা ছিল বিপরীত।

এই অবস্থার সুযোগ নেয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও রাজভক্ত মুসলিম ভূস্বামী শ্রেণি। তাদের পক্ষে মুসলিম জনসাধারণকে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তোলা সম্ভব হয়। সৈয়দ আহম্মদ খান সহ অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশেষ অধিকারের দাবি জানান। তাঁরা এই প্রচার চালিয়েছিলেন যে শিক্ষিত মুসলমানেরা যদি ব্রিটিশের অনুগত বা রাজভক্ত হয় তবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তাদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করবে, অন্যান্য অনেক প্রকার বিশেষ অনুগ্রহও তারা ভোগ করতে পারবে। এই প্রক্রিয়াতে ব্রিটিশের অনুগত মুসলিম জমিদার ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব দখল করে।

সমাজের গণতন্ত্রীকরণের কাজটি এড়িয়ে যায় কংগ্রেস নেতৃত্ব

রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার আমদানি এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এগুলির মূল্যায়নের মূলে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা, যা সংখ্যালঘু শ্রেণির মনে নিরাপত্তার অভাব জাগিয়ে তোলে। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় নেতৃত্বের এমন বিচক্ষণ পদক্ষেপ বা কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল যার দ্বারা মুসলমানদের মন থেকে এই আশঙ্কা দূর করা যায়। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সংখ্যালঘুদের প্রতি তাদের আচরণের মধ্য দিয়েই মুসলমানদের মন থেকে সন্দেহের বীজ তুলে ফেলা সম্ভব ছিল। কিন্তু এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি উচ্চবর্ণ হিন্দু প্রধান জাতীয় তথা কংগ্রেস নেতৃত্বের দিক থেকে অবহেলিতই থেকেছে।

দ্বিতীয়ত আর্থিক ব্যবস্থা বা শাসননীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব করা হবে না, নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এমন দৃঢ় আশ্বাসেরও প্রয়োজন ছিল। একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষেই এটি নিশ্চিত করা সম্ভব ছিল। অথচ তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেস গড়েই উঠেছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়া পুঁজিবাদের অংশ হিসাবে। স্বাভাবিক ভাবেই তা কোনও সংগ্রামী সংগঠন হিসাবে নয়, ব্রিটিশকে শাসক হিসাবে মেনে নিয়ে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে কিছু দাবি আদায়ের প্ল্যাটফর্ম হিসাবেই গড়ে উঠেছিল। পরে ভারতীয় পুঁজি আরও শক্তিশালী হলে এ দেশে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশকে হটিয়ে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির নেতৃত্বে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তার লক্ষ্য হয়ে ওঠে। রাশিয়ায়

মহান লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকের সরকার প্রতিষ্ঠার পর এ দেশেও শ্রমিক-কৃষক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে শোষণহীন সমাজপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গভীর আকর্ষণ তৈরি হয়। কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারতেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলনের মারাত্মক ভয়ে ভীত ছিল। কারণ এই আন্দোলন সফল হলে আন্দোলনের নেতৃত্ব জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণির হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। ফলে কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতার আন্দোলন ব্রিটিশের প্রতি আপসহীন হওয়ার পরিবর্তে কার্যত আপসমুখী তথা সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধতাবাদী হয়ে পড়ে। ধর্মীয় চিন্তা, জাতপাত প্রভৃতির বিরুদ্ধে সমাজগণতান্ত্রিক চিন্তার প্রসারের মধ্য দিয়ে সমাজের গণতন্ত্রীকরণের কাজটি কংগ্রেস এড়িয়ে যায়। এই অবস্থায় জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষে যেমন যথার্থ গণতান্ত্রিক হওয়া সম্ভব ছিল না, তেমনই ধর্মনিরপেক্ষ হওয়াও সম্ভব ছিল না। ফলে ভারতীয় জনসাধারণ ধর্ম-বর্ণ-ভাষাগত কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হিসাবেই থেকে গেল।

কংগ্রেসের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ

কংগ্রেস নেতৃত্ব জনসাধারণকে ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সমাজের গণতন্ত্রীকরণের ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট ছিল তাই নয়, তারা ধর্মকে জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। কংগ্রেস নেতারা জাতীয়তার ভারতীয় ভিত্তিভূমির খোঁজ করতে গিয়ে হিন্দু ধর্ম এবং সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু সংস্কৃতিরই আশ্রয় নেন। অথচ তাঁরা যদি পাশ্চাত্যের আধুনিক রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকাতেন, যদি এই সব দেশগুলিতে জাতি গঠনের প্রক্রিয়াটিকে পর্যবেক্ষণ করতেন তবে তাঁদের এই ভুল হত না। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের এই গাঁটছড়া জাতীয় এক্যের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। ধর্মকে জাতীয়তা প্রচারের মাধ্যম করায় কংগ্রেসের নেতাদের একটি অংশের বক্তৃতায় ও রচনায় হিন্দু ধর্মীয় প্রভাব কাজ করতে থাকে। ভারতের মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত সংস্কৃতির উপর কোনও গুরুত্ব না দিয়ে এঁরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে দেশের মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকেন। বাল গঙ্গাধর তিলক প্রবর্তিত গণপতি ও শিবাজি উৎসব, অরবিন্দ ঘোষের পৌরাণিক ধাঁচে ভারতকে মাতৃরূপে চিন্তা বা জাতীয়তাবাদ ও ধর্মের অভিন্নতার ধারণা, বিপ্লবীদের কালী মূর্তির সামনে অথবা গীতা ছুঁয়ে শপথ, গঙ্গা-স্নান করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা— এই ধরনের ব্যাপারগুলি ইসলাম ধর্মসম্মত না হওয়ায় মুসলমান সম্প্রদায় সমর্থন করতে পারেনি। এগুলি দেখিয়ে ব্রিটিশ শাসকরা ও জাতীয়তাবাদ বিরোধী সাম্রাজ্যবাদের দালাল মুসলিম নেতাদের পক্ষে মুসলিম জনতাকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়েছে। এ কথা বোঝানো সহজ হয়েছে যে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারত ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হলে হিন্দুদের স্বৈরাচারী শাসনই কায়ম হবে। সেখানে মুসলিমদের কোনও নিরাপত্তা থাকবে না। এই প্রচার মুসলমানদের মনে জাতীয়তাবাদের প্রতি সন্দেহ ও বিতৃষ্ণা তৈরি করে। বহুসংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে সরে যান, কেউ কেউ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণও করেছিলেন। বস্তুত এঁরা সহজেই সাম্প্রদায়িকতাবাদের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতারা দেশের মধ্যে ‘হিন্দু’ শিবাজি অথবা ‘হিন্দু’ রানা প্রতাপকে কেন্দ্র করে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারের চেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও শৌর্যের প্রতি ততটা গুরুত্ব

দেননি। এই জাতীয়-বীরেরা আকবরের মতো ‘বিদেশির’ বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এটার উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এই ধরনের চিন্তা শিবাজি, রানা প্রতাপ, আকবর বা ঔরঙ্গজেব— কারওরই যথার্থ ইতিহাসসম্মত মূল্যায়ন নয়।

অবশ্য কংগ্রেসের সব নেতারা মুসলিম-বিরোধী অথবা পুরোপুরি সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন— এমন নয়। তিলক সহ এই জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় প্রত্যেকেই হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনে সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা বলতেন যে, দেশকে ভারতমাত্ররূপে কল্পনা একটি আধুনিক ধারণা, এর সঙ্গে ধর্ম বা হিন্দুত্বের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এ কথার কোনও মূল্য স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিম নেতা বা জনসাধারণের কাছে ছিল না। কারণ উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে উত্তর ভারত জুড়ে নানা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। বিশ শতকের শুরুতে হিন্দু মহাসভা গড়ে ওঠার পর দেখা যায়, কংগ্রেসের অনেক বড় নেতাই হিন্দু মহাসভারও নেতা হিসাবে কাজ করছেন। চতুর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও তাদের স্বপক্ষীয় ব্যক্তিরা জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের উপর হিন্দুধর্মীয় প্রভাবের এই দিকটির ফলাও প্রচার চালায়।

ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লিগের জন্ম

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯০৬-এ ইংরেজদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লিগের জন্ম হয়। একশ্রেণির শিক্ষিত মুসলমান এবং মুসলমান নবাব ও ভূস্বামীদের বিচ্ছিন্নতাবাদের মনোভাব ও ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যের চরম প্রকাশ হিসাবে দেখা গিয়েছে সর্বভারতীয় মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা। লিগ প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ এবং নবাব মহসীন-উল-মুলক। মুসলিম লিগ বঙ্গবিভাগে সম্মতি দিয়েছিল এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষণ বা রক্ষা-কবচের দাবি তুলেছিল। পরে, বড়লাট লর্ড মেয়োর পরোচনায় লিগ পৃথক নির্বাচনের অধিকার তুলে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার পেয়েছিল। বড়লাট লিগকে এ বিষয়ে সাহায্যও করেছিলেন। মনে রাখা দরকার, মুসলমানদের জন্য এই জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রথম কোনও মুসলিম প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আসেনি। ১৮৮৮ সালে ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনই প্রথম এই রকম একটি প্রস্তাব দেন। এর অনেক পরে ১৯০৯-এ ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই দাবি তোলা হয়। ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হওয়া ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট অনুসারে (যা মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার নামে পরিচিত), কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়। মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনী এলাকা চালু করা হয়, যেখানে শুধুমাত্র মুসলিম ভোটাররা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারতেন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তির এই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রেরই পরিণাম। স্বাভাবিক ভাবেই মর্লি-মিন্টোর এই উদ্যোগ হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে সংহত হতেই সাহায্য করেছিল। যা জন্ম দিয়েছিল প্রথমে হিন্দু মহাসভার, পরে আরএসএসের।

(চলবে)

তথ্যসূত্র : মধ্যযুগের ইতিহাস, বিপান চন্দ্র।
দেশভাগ, পঞ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনি,
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা মাও সে তুঙ স্মরণে



৯ সেপ্টেম্বর বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও চীন বিপ্লবের রূপকার মাও সে তুঙ-এর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে দলের শিবপুর সেন্টারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ (বাঁ দিকের ছবি)।

ওই দিন দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন ও মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মালাদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কমরেড মাও সে তুঙের উদার নীতিবাদকে পরাস্ত করুন' লেখাটি পাঠ করা হয়।

পশুহাট বাঁচানোর দাবিতে কলকাতায় বিশাল সমাবেশ



নতুন রাজ্য সরকার ১৩ মে পশু জবাই সংক্রান্ত নতুন নিয়ম চালু করায় তখন থেকেই পশু হাটগুলি বন্ধ রয়েছে। এতে বিপন্ন হয়েছে গোপালক, গো-ব্যবসায়ী, চর্ম সংগ্রাহক, চর্মশিল্পের

শ্রমিক-কর্মচারী, পশুহাটের সাথে যুক্ত হোটেল, ছোট ব্যবসায়ী সহ নানা পেশার প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা। এঁদের পরিবারের সদস্য সহ প্রায় দু'কোটি মানুষের জীবনে নেমে এসেছে

বিপর্যয়। এই অবস্থার প্রতিকারে জেলায় জেলায় হাটগুলির প্রতিনিধিদের সংগঠিত করে ৮ আগস্ট কলকাতায় সারা বাংলা কনভেনশনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে সারা বাংলা পশুপক্ষী হাট বাঁচাও সমিতি। ১০ সেপ্টেম্বর সমিতির ডাকে কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হল মহাসমাবেশ ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগের মন্ত্রী কাছে গণডেপুটেশন।

১৫টি জেলার চার হাজারেরও বেশি মানুষের এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অ্যাডভোকেট আবুয়েল

শুশাহানা মণ্ডল। প্রধান অতিথি ছিলেন দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের নেতা এআইকেকেএমএস-এর সাধারণ সম্পাদক শংকর ঘোষ।

বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন জেলা নেতৃত্ব ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুণ্ডু। সভা শেষে সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করেন।



হলদিয়ায় দুর্গতদের পাশে এআইডিওয়াইও

পূর্ব মেদিনীপুরে মজে যাওয়া নিকাশি ব্যবস্থা ও অতি বর্ষণের কারণে দু'মাস যাবত হলদিয়া বিধানসভার মনিরামপুর, গোবিন্দপুর, জামবেড়িয়া, মনোহরপুর, বারতলা ইত্যাদি গ্রামে এখনও জল জমে আছে। কোথাও কোথাও ঘরের ভিতরেও জল রয়েছে।

এআইডিওয়াইও-র হলদিয়া ইউনিটের উদ্যোগে ১৩ সেপ্টেম্বর এমন শতাধিক দুর্গত পরিবারের হাতে খাদ্য ও ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া

হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক আশীষ দোলাই, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শ্যামসুন্দর দাস, হলদিয়া ইউনিট সভাপতি অনুপ গিরি সহ নেতা-কর্মীরা। ২০ সেপ্টেম্বর সুতাহাটা বাজারে হলদিয়া এলাকায় জল নিকাশি ব্যবস্থার দ্রুত সংস্কার এবং মাস্টার প্ল্যানের দাবিতে যে কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে, সেখানে এলাকার তরুণ-যুবকদের অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান তাঁরা।

বিনামূল্যে ২০০ ইউনিট বিদ্যুতের প্রতিশ্রুতির কী হল?

নতুন রাজ্য সরকারও দুর্গাপূজায় বিদ্যুৎ বিলে ১০০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এ প্রসঙ্গে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)-র, সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস ১১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

সরকার পরিবর্তন হলেও দুর্গাপূজো কমিটিগুলিকে আর্থিক অনুদান দেওয়া এবং পূজো মণ্ডপে আলোকসজ্জার জন্য বিদ্যুতের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার নীতির কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। অথচ এই ছাড়ের জন্য প্রয়োজনীয়

সরকারি তহবিলের টাকা জোগান দেবে যে সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহক, তাদের স্বার্থের কথা রাজ্য সরকার ভাবতে পারছে না। নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল গৃহস্থে প্রতি মাসে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং কৃষিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে।

এখনও পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হল না। ক্ষুদ্রশিল্পে মিনিমাম চার্জ ২০০ টাকা প্রতি কেভিএ প্রতি মাসে হওয়ায় রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তা বাঁচাতে সরকারের কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদ

কলকাতা কর্পোরেশনের ১৪৪টি ওয়ার্ড ভেঙে ২০৯টি ওয়ার্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। প্রতিবাদে কমিশনারের কাছে ৮ সেপ্টেম্বর ডেপুটেশন দিল এসইউসিআই(সি)-র কলকাতা জেলা কমিটি। দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আয়সানুল হকের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের পদ্ধতিকে অস্বচ্ছ ও অগণতান্ত্রিক বলে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

তাঁরা বলেন, ডিলিটেড ভোটাররা বর্তমানে ট্রাইবুনালের বিচারাধীন। ট্রাইবুনালে যতটুকু বিচার হয়েছে, তাতে সিংহভাগ ভোটার বৈধ বিবেচিত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির নিষ্পত্তি ও পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত না করে তড়িঘড়ি ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ কতটা যুক্তিযুক্ত? এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর অভিযোগ,

বিজেপির সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ ও হীন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দলের বক্তব্য, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কখনও রাজনৈতিক স্বার্থে পরিচালিত হতে পারে না। জনগণের প্রতিনিধিত্ব, প্রশাসনিক সুবিধা, জনসংখ্যার ভারসাম্য এবং ভোটারদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে স্বচ্ছ, যুক্তিসঙ্গত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করতে হবে। এ দিন প্রতিনিধিদল দাবি জানান, প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশনের ভিত্তি, মানদণ্ডসংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ নথি প্রকাশ্যে আনতে হবে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের মতামত গ্রহণ করতে হবে। বিচারাধীন ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয়গুলির অবস্থান স্পষ্ট না করে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া চলবে না।

পেনশন চালুর দাবিতে বিক্ষোভ ব্যাঙ্গালোরে

কর্ণাটকে কংগ্রেস পরিচালিত সরকার রাজ্যের পেনশন ও অন্যান্য সহায়তা-ভাতা প্রাপক ১৮ লক্ষ মানুষের নাম সন্দেহের তালিকায় তুলে তাঁদের নথিপত্র নতুন করে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পরিণামে গত কয়েক মাস ধরে পেনশন সহ অন্যান্য সরকারি ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এর ওপর নির্ভরশীল বৃদ্ধ, বিধবা, বিকলাঙ্গ সহ বিপুল সংখ্যক মানুষ ভয়ঙ্কর দুর্গতিতে পড়েছেন। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে ও ন্যায্য প্রাপকদের জন্য দ্রুত সরকারি ভাতা চালুর দাবিতে ২৭ আগস্ট ব্যাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কে এসইউসিআই(সি)-র ডাকে বিক্ষোভ সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা কমিটির



সদস্য এন রবি। জেলা সম্পাদক ভি জ্ঞানমূর্তি, জয়ান্না, হেমাবতী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। এক প্রতিনিধিদল রাজস্ব দফতরের কমিশনারের অনুপস্থিতিতে তহশিলদারের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন। তাঁরা সমস্যাটির দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।